

না-পড়ে-পণ্ডিত হওয়া সম্ভব হলেও না-লিখে-লেখক হওয়া যায় কি না সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, এবং সেই জগুই মাসিকপত্রের বংশবৃদ্ধিটি স্থখের কিংবা দুঃখের বিষয়, সেবিষয়ে আমি মনস্থির করে উঠতে পারি নি।

সাময়িক সাহিত্য যে অপাঠ্য, অক্ষার ওআইন্ডের এ মত আমাদের গ্রাহ্য করবার দরকার নেই। মাসিক সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্র সম্বন্ধে অক্ষার ওআইন্ড যে মত প্রকাশ করেছেন, তাঁর চাইতে ঢের বড় লেখক চার্লস ল্যাম্ সাহিত্য সম্বন্ধে সেই একই মত প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'একখানি নতুন বই প্রকাশিত হলে একখানি পুরনো বই প'ড়ে'। এর থেকে বোঝা যায় যে সেকালের মায়ায় আমরা স্বকালের মর্ষাদা বুঝতে পারি নে। কারও-কারও মতে নবসাহিত্য রচনা করা আর সরস্বতীর শ্রাদ্ধ করা একই কথা— তা মাসিকই হোক, আর সাংবৎসরিকই হোক।

তবে বইয়ের সঙ্গে মাসিকপত্রের যে একটা প্রভেদ আছে, তা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য। বই লেখে একজনে, আর মাসিকপত্র অনেকে মিলে। এককথায়, মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরস্বতীর বারোয়ারি পূজা করা। কাজেই ব্যাপারটা অনেক সময়ে গোল-হরিবোলে পরিণত হয়। তার পর যেখানে চাঁদা করে কার্য উদ্ধার করতে হয়, সেখানে জাতবিচার করা চলে না— ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের পক্ষে সে উৎসবে যোগদান করবার সমান অধিকার আছে। গোল তো এই নিয়েই।

সকলে কথা কইতে পারলেও যে গান গাইতে পারে না, হাঁটতে পারলেও যে নাচতে পারে না, একথা সকলেই জানেন এবং সকলেই মানেন। কিন্তু অনেকে লিখতে পারলেও যে 'লিখতে' পারে না, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি।

'হারিয়ে বসে আছি' বলবার কারণ এই যে, সংগীতের মত লেখা-জিনিসটেও যে একটি আর্ট, এ জ্ঞান আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল। সকল আলংকারিক একবাক্যে বলে গেছেন যে, কাব্যরচনা করবার জগু দুটি জিনিস চাই— প্রথমত, প্রাক্তন সংস্কার ; দ্বিতীয়ত, শিক্ষা।

একালের অনেক লেখকের বিশ্বাস যে, সাহিত্যিক হবার জগু একমাত্র প্রাক্তন সংস্কারই যথেষ্ট, শিক্ষা-দীক্ষার কোনোরূপ আবশ্যক নেই ; কেননা তাঁদের লেখা পড়ে বোঝা যায় না, তাঁরা তাঁদের নৈসর্গিকী প্রতিভা ব্যতীত অপর কিসের উপর নির্ভর করেন। মহর্ষি চরকের শিষ্য অগ্নিবেশ বলেছেন যে, যেসকল চিকিৎসকের গুরু নাম কেউ জানে না তাঁদের কোনো সতীর্থ নেই, তাঁরা 'দ্বিজিহ্ব বায়ু-ভক্ষকাঃ'। এই শ্রেণীর সাহিত্য-চিকিৎসকের দল যে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেবিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই ; এবং মাসিকপত্রসকল এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য।

বাংলাদেশে আজকাল যদিও-বা লেখক থাকে তো লেখবার বিষয় বড়-একটা নেই। লেখবার সামগ্রীর যে অনটন ঘটেছে তার প্রমাণ, আজকাল কি লেখা উচিত, কি ভাষায় লেখা উচিত, কি ধরনে লেখা উচিত— এইসব নিয়ে সকলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। কি শহুরে কি পাড়াগোঁয়ে, এমন মাসিকপত্র নেই, যা এই পণ্ডিতের বিচারে যোগদান করে নি।

এসকল তর্কবিতর্কের যে কোনো সার্থকতা নেই, একথা আমার মুখে শোভা পায় না। তবে এইসব আলংকারিক-তত্ত্ব নিয়ে এতটা দেশজোড়া আন্দোলন হওয়াটাই আক্ষেপের বিষয়। কেননা, এসব সমস্তার বিচার করতে হলে, প্রথমত, সে বিচার করবার শিক্ষা এবং শক্তি থাকা আবশ্যিক; দ্বিতীয়ত যুক্তিযুক্ত তর্ক করবার অভ্যাস থাকা আবশ্যিক।

কিন্তু ঘটনা হচ্ছে অগুরূপ। নিত্যই দেখতে পাই যে ঝাঁরা দু ছত্র সোজা করে লিখতে পারেন না, তাঁরাও রচনারীতি নিয়ে মস্ত-মস্ত আঁকাবাঁকা প্রবন্ধ লেখেন। তার পর দেখতে পাই, এইসব লেখকদের বৈষয়ের অপেক্ষা বীর্ষ ঢের বেশি। এঁরা যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না— উপদেশ দেন, আদেশ করেন। সম্ভবত এঁদের বিশ্বাস যে, রাগের মাথায় যেকথা বলা যায়, তা সত্য হতে বাধ্য। এঁরা ভুলে যান যে ক্রোধাক্ত হলে মাহুষের দিগ্বিদিক-জ্ঞান থাকে না।

কলে, এঁরা সাহিত্যের যেসব ইঁটপাটকেল কুড়িয়ে পান তা মাতৃভাষার উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করেছেন। আমার স্বমুখে তিনখানি মাসিকপত্র খোলা রয়েছে; তার একখানিতে মাতৃভাষাকে ‘কিন্ধিয়ার ভাষা’ [সাহিত্য-সংহিতা], আর-একখানিতে ‘পেঙ্গিভাষা’ [ভারতী], আর-একখানিতে ‘চণ্ডালীভাষা’ [উপাসনা] বলা হয়েছে। এরকম কথা ঝাঁরা মুখে আনতে পারেন, তাঁদের কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন; কেননা, তাঁরা যে বঙ্গসরস্বতীর কতদূর স্বেচ্ছাস্তান, তার পরিচয় নিজ-মুখেই দেন। কিন্তু আমাদের মাসিকপত্রসকল যে এইসব অকথা কুকথা প্রচারের সহায়তা করেন— তার থেকে বোঝা যায় যে, বাংলার বন্দেমাতরম্-যুগ চলে গিয়েছে।

আমাদের লেখবার বিষয় যে বড়-একটা নেই, তার অপর প্রমাণ— বাংলা মাসিকে প্রত্নতত্ত্বের প্রাধান্য। প্রত্নতত্ত্ব আর-যাই হোক, সাহিত্য নয়। ও বস্তু মূল্যবান, এই হিসেবেই যদি প্রত্নতত্ত্বকে মাসিকপত্রে স্থান দেওয়া হয় তা হলে রত্নতত্ত্বই বা বাদ যায় কেন। তবে যদি সম্পাদকমহাশয়েরা বলেন, বাংলার সাহিত্যওয়ালাদের মধ্যে কোনো জহুরি নেই, তা হলে অবশ্য আমাদের নিরুত্তর থাকতে হবে।

মাসিক সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে ছোটগল্প। এই ছোটগল্প কিভাবে লেখা উচিত সেবিষয়েও আজকাল আলোচনা শুরু হয়েছে। এও আর-একটি প্রমাণ যে,

লেখবার বিষয়ের অভাববশতই লেখবার পদ্ধতির বিচারই আমাদের দায়ে পড়ে করতে হয়।

এসম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলবার আছে। আমার মতে ছোটগল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই, তার পরে ছোট হওয়া চাই; এ ছাড়া আর-কিছুই হওয়া চাই নে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে 'গল্প' কাকে বলে, তার উত্তর 'লোকে যা শুনতে ভালোবাসে'। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন 'ছোট' কাকে বলে, তার উত্তর 'যা বড় নয়'।

এর উত্তরে পাঠক আপত্তি করতে পারেন যে ডেফিনিশনটি তেমন পরিষ্কার হল না।' এস্থলে আমি ছোটগল্পের তত্ত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি। এবং আশা করি সকলে মনে রাখবেন যে তত্ত্বকথা এর চাইতে আর পরিষ্কার হয় না। এর জন্ম দুঃখ করবারও কোনো কারণ নেই; কেননা, সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্যরচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তার পরে তার তত্ত্ব। শেষটি না থাকলেও চলে, কিন্তু প্রথমটি না থাকলে সাহিত্যজগৎ শূন্য হয়ে যায়। এ বিপদ যে স্মৃখে নেই, তাও ভরসা করে বলা চলে না। কেননা, মাসিকপত্রে লেখবার লোক অনেক থাকলেও তাঁদের লেখবার বিষয় অনেক নেই; আর লেখবার বিষয় অনেক থাকলেও তা লেখবার অনেক লোক নেই। ফলকথা, সাহিত্যের প্রবৃদ্ধি হয় যোগে, আর তার শ্রীবৃদ্ধি হয় গুণে।

শ্রাবণ ১৩২৩